শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৯, ৩ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ ১৪২২ (২ অগাষ্ট ২০১৫) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

বিশেষ কিশোরকুমার সংখ্যা

কিশোরকুমার অভিনীত, প্রযোজিত, পরিচালত ছবির তালিকা পাতা ২, ৪, ৫
অমিতকুমার এবং রাহুল দেববর্মনের লেখায় কিশোরকুমার স্মরণ পাতা ৬
কিশোরকুমারের জীবনপঞ্জি পাতা ৮ কিশোরকুমারের সাক্ষাৎকার পাতা ৭
কিশোরকুমার সুরারোপিত বাংলা গানের তালিকা পাতা ২

সমগ্র সংখ্যাটির পরিকল্পনা, সংকলন ও রূপায়ণ — *জহর চট্টোপাধ্যায়*

শিক্ষা আনে চেতনা

সম্পাদকীয়

আর. কে. লক্ষ্মণের আঁকা কিশোরকুমার

কিশোরকুমার এই নামটার সঙ্গে আপামর ভারতবাসীর নিজস্ব জীবনের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কিশোরকুমারের গানই তো তাদের মুখের ভাষা, বুকের ব্যথা, সুখের উল্লাস হয়ে বেজে উঠেছে। জীবনের সব অনুভূতিই যেন প্রকাশের সহজ রাস্তা পেয়ে যায় এই সব গানে। যতই তিনি বলুন 'গানেরই গ জানি না', তবু তাঁর গানেতেই সবাই মাতোয়ারা। হিন্দি ছবির অন্যতম সেরা কৌতুক অভিনেতা হিসাবে তাঁকে সবাই যেমন মনে রাখবে তেমনিই সংবেদশীল চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবেও তিনি প্রশংসনীয়। চলচ্চিত্রের প্রতিটি বিভাগেই তাঁর স্বকীয়তার ছাপ রয়ে গেছে। প্রযোজক, পরিচালক, গল্পকার, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার — এই সব পরিচয়কে ছাপিয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় গায়কের। তিনি নিজেও এই পরিচয়ে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। হিন্দি ছবির গান আর কিশোর কুমার যেন সমার্থক হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন সাধারণের গায়ক, তাই তাঁর গাওয়ার পর রবীন্দ্রসঙ্গীতও সাধারণের প্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে। জন্মের পঁচাশি বছর পূর্ণ হল এই কিংবদন্তী হয়ে ওঠা গায়কের। মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরেও তাঁর গানের জনপ্রিয়তা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকেই জানান দেয়। অন্যভাবে দেখলে নিজের নানা দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতাকে নিয়ে শুধু মনের জোর আর কঠিন অধ্যাবসায় দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করার এক জ্বলন্ত উদাহরন কিশোরকুমার। তাঁর এই লড়াকু মনোভাবকেই কুর্নিশ জানাতে তাঁকে নিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা।

ডান দিকের উপরের তালিকার শেষ ছয়টি ছবি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ছবিগুলির মধ্যে ***নীলা আসমান*** (৪টি), ***সুহানা গীত*** (৭টি), ***প্যার আজনবী হ্যায়*** (৫টি), ***ব্যাণ্ড মাস্টার চিক চিক বুম*** (৩টি), ***দীনু কা দীননাথ*** (১টি), ***যমুনা কে তীর*** (১টি) গান তৈরী হয়েছিল। এই ছবিগুলি ছাড়াও কিশোর কুমার আরও চারটি ছবির শুধু নাম ঘোষণা করেন। 'কিশোর ফিল্মস্'-এর ব্যানারে এই চারটি ছবি হল ***তবলা প্রসাদ ধামাকাবা, দিল্লী কি বিল্লি বম্বাই কা বিল্লা, অকসর, জাহিল***। পরবর্তীকালে ***নীলা আসমান***-এর 'এক পঞ্ছী দীওয়ানা' এবং ***সুহানা গীত*** -এর 'গুন গুন গুন ভ্রমরা' গান দুটির সুরে হেমা মালিনী দুটি বাংলা গান রেকর্ড করেন। 'মেরা গীত অধুরা হ্যায়' গানটি প্রথমে ***সুহানা গীত*** -এর জন্য দ্বৈত সঙ্গীত হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছিল, গানটি কিশোরকুমার একক সঙ্গীত হিসাবে পুনরায় রেকর্ড করেন ***মমতা কি ছাঁও মেঁ*** ছবির জন্য। এই গানটির সুরে 'আমি প্রেমের পথের পথিক' বাংলা গানটি কিশোরকুমার রেকর্ড করেন। ***প্যার আজনবী হ্যায়*** ছবির শীর্ষ সঙ্গীতটির সুরে 'প্রেম বড় মধুর' গানটি বাংলা আধুনিক গান হিসাবে রেকর্ড করেন। ১৯৭৩ সালে কিশোরকুমারের সুরে '**মনে মনে কতদিন**' আর '**জিনিসের দাম বেড়েছে**' গান দু'টি অমিতকুমারের প্রথম বংলা গানের রেকর্ড।

কিশোরকুমার সুরারোপিত হিন্দী চলচ্চিত্র

সাল	ছবির নাম	প্রযোজক	চিত্র পরিচালক	গীতিকার
১৯৬১	ঝুমরু	অনুপ শর্মা	শঙ্কর মুখার্জী	কিশোরকুমার, মজরুহ সুলতানপুরী
১৯৬৪	দুর গগন কি ছাঁও মেঁ	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার, শৈলেন্দ্র
১৯৬৭	হাম দো ডাকু	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	শৈলেন্দ্র
১৯৭১	দূর কা রাহী	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার, শৈলেন্দ্র, এ.ইরশাদ
১৯৭২	জমিন আশমান	এ. বীরাপ্পান	এ. বীরাপ্পান	ইন্দিবর, আনন্দ বক্সি
১৯৭৪	বাড়তি কা নাম দাড়ি	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার, এ.ইরশাদ
১৯৭৮	সাবাশ ড্যাডি	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার, এ.ইরশাদ, গুলশন বাওরা
১৯৮১	চলতি কা নাম জীন্দেগি	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	আনজান, এ.ইরশাদ, নূর দেবাসী
১৯৮২	দূর বাদিয়োঁ মে কাঁহী	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	*(ছবিতে কোনো গান ব্যবহার হয়নি)*
১৯৮৯	মমতা কি ছাঁও মেঁ	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোর কুমার,শৈলেন্দ্র, আনজান, হসরত জয়পুরী
—	নীলা আশমান	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার
—	সুহানা গীত	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	শৈলেন্দ্র
—	প্যার আজনবী হ্যায়	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	যোগেশ, সুদর্শন ফকির
—	ব্যাণ্ড মাস্টার চিক চিক বুম	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	শৈলেন্দ্র
—	দীনু কা দীননাথ	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার
—	যমুনা কে তীর	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার

কিশোরকুমার সুরারোপিত বাংলা আধুনিক গান

সংখ্যা	সাল	গান	গায়ক/গায়িকা	গীতিকার
১.	১৯৭৬	এই কটা দিন নয়, হেসে খেলে যাও চলে	অমিতকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
২.	১৯৭৬	ফুল ফোটে ফুল ঝরে দিনগুলো যায় চলে	অমিতকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৩.	১৯৭৮	ডাইনে যেও বাঁয়ে যেও, যেওনা পথের মধ্যিখানে	অমিতকুমার	স্বপন চক্রবর্তী
৪.	১৯৭৮	এখনি বোলো না যাই, এই তো এলে,	অমিতকুমার	স্বপন চক্রবর্তী
৫.	১৯৭৮	কিছু স্বপ্ন নিয়ে যাও, চোখে তার এঁকে দাও	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
৬.	১৯৭৮	সোনা সোনা হাসিমুখ, কোনো কথা নেই কেন	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
৭.	১৯৮০	আজ ঘরে দীপ জ্বলে তবু মনেতে আলো কেন হল না	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
৮.	১৯৮০	যে নাম নিতে দিন রাত হল, সে যেন অজানা কুয়াশা	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
৯.	১৯৮০	বল কেমন করে যে জমল এ চোখে কজরারী বাদল	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
১০.	১৯৮০	আরে আপনি কি যা তা বকবক করছেন...মনে শান্তি নেই	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
১১.	১৯৭৪	ফেরারী হয়েছে মন দূরেরই আঁধারে কোন	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
১২.	১৯৭৪	হে শোনো ওখানে কেনো থামলে কি করে তুমি জানলে	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
১৩.	১৯৭৩	মনে মনে কতদিন, কত ছবি আঁকা হল,	অমিতকুমার	মুকুল দত্ত
১৪.	১৯৭৩	ওরে ওরে ওরে ওরে ভজহরি...জিনিসের দাম বেড়েছে	অমিতকুমার কিশোরকুমার	মুকুল দত্ত
১৫.	১৯৭৭	গুন গুন গুন করে যে মন, তারে কেন ভোলানো গেল না	হেমা মালিনী	মুকুল দত্ত
১৬.	১৯৭৭	কাঁদে মন পিয়াসী, কোন দাসীর বাঁশির বিরহে ডাকে আমায়	হেমা মালিনী	মুকুল দত্ত
১৭.	১৯৭৬	আমার মনের এই ময়ূরমহলে এসো আজ প্রোমের	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
১৮.	১৯৭৭	আমার দীপ নেভানো রাত, নেই দুঃখের কেউ সাথী হায়	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
১৯.	১৯৭৭	কেন তুমি চুপি চুপি আমার মন নিয়ে যাও	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
২০.	১৯৭৭	ও...হো...চল যাই চলে যাই দূর বহুদূর	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
২১.	১৯৭৬	চারিদিকে পাপের আঁধার...মানুষ জন্ম দিয়ে বিধি	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
২২.	১৯৭৭	সে দিনও আকাশে ছিল কত তারা, আজও মনে আছে	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
২৩.	১৯৮৭	অন্ধকারের এই রাতের শেষে আঁধার কেন ঘুচল না	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪.	১৯৮৭	এ জীবন প্রেমেরই এক পাতাবাহার কবিতা	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫.	১৯৮৭	আমি দুঃখকে সুখ ভেবে বইতে পারি যদি তুমি পাশে থাক	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬.	১৯৮৭	আমি প্রেমের পথের পথিক, ঘুরি পথে পথে যদি তারে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭.	১৯৮৭	আমার আঁধার ভুবনে কে তুমি জ্বেলেছো প্রদীপখানি	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮.	১৯৮৬	একদিন আরো গেল, থামানো আর গেল না,	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯.	১৯৮৬	ও রে বন্ধুরে, ও রে সাথী রে, ডাক দিয়েছে আগামী কাল	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০.	১৯৮৬	হুঁ, প্রেম যেন এক অতিথির মত...প্রেম বড় মধুর	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১.	১৯৮৬	এই এই দেখ ওই থিয়েটারের ক্লাউনটা...ডাকে লোকে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২.	১৯৮৬	সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা, রং ছিল ফাল্গুনী হাওয়াতে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩.	১৯৮৬	আ হা হা, ইয়ে অ্যায়সা বয়সা...সিগারেট নহ তুমি শ্বেতপরী	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪.	১৯৮৭	হে প্রিয়তমা আমি তো তোমায় বিদায় কখনো দেব না	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫.	১৯৮৬	দু চোখে দেখিনা তোমায় তবু ও আছ...হাওয়া মেঘ সরায়ে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬.	১৯৮৭	যখন আমি অনেক দূরে থাকব না আর মাটির ঘরে,	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭.	১৯৮৬	অনেক কাহিনী শুনেছ গল্প কথা...রাখাল চন্দ্র মাতাল	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮.	১৯৭৩	এই যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই তারে	কিশোরকুমার	মুকুল দত্ত
৩৯.	১৯৭৩	নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে কত কি রয়েছে লেখা	কিশোরকুমার	মুকুল দত্ত
৪০.	১৯৭৪	কি লিখি তোমায়, প্রিয়তমা, কি লিখি তোমায়, তুমি ছাড়া	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
৪১.	১৯৭৪	ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যাও,	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত

এ ক টা না লে খা ডা য়ে রি র ক য়ে ক টা পা তা

কিশোরকুমার

কিশোর কুমার, তেনজিং ও রুমা দেবী

আমি কোনোদিনই ডায়েরি লিখি না, আমার স্ত্রী রুমা নিয়মিত ডায়েরি লেখে। তাই নিজের কথা বলতে হলে স্ত্রীর ডায়েরির কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আমাদের বিবাহিত জীবনের কথা বলা যাবে কিন্তু ছেলেবেলার কথা বলতে গেলে আমার স্মৃতির সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমার বড় ভাই অশোককে আমার প্রথম প্রথম একজন অচেনা মানুষ মনে হত। আমি জানতাম আলো, মানে অনুপই আমার একমাত্র ভাই। তাই কুড়ি একুশ বছরের একজন সুদর্শন যুবক অশোক কলেজের ছুটিতে বাড়ি এলে বাবা মাকে তার খাতির যত্ন করতে দেখে খুব অবাক লাগত। ভাবতাম এ কে রে, যে বাড়িতে এলে বাড়ির সকলে এত খুশি হয়? পরে বুঝলাম যে সে আমাদের বড় দাদা।

আমার বালক বয়েসের যে ছবিটা সকলে দেখেছেন তাতে আমাকে লাজুক মনে হলেও স্বভাবে আমি ছিলাম এর বিপরীত। সবসময় দুষ্টুমি আর বদমাসি করার সুযোগ খুঁজতাম। আমি, আলো আর আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে বাড়ির পিছনে একটা মঞ্চ বানিয়ে নাটক নাটক খেলতাম। আমাদের মধ্যে একজন হত 'হিরো', একজন 'ভিলেন' আর একজন হত 'হিরোইন'। বাকিরা যে যার মত ভূমিকা নিত। তবে আমাদের খেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেত আমাদের থেকে বয়সে বড় একটা ছেলে। সে বাড়ির পাঁচিলে বসে থাকত আর বাবাকে আসতে দেখলেই লাফ দিয়ে নেমে আসত। বাবা আমাকে দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে গিয়ে পড়তে বসিয়ে দিত।

আমি যখন পাঁচ ক্লাসে পড়ি তখন অশোক স্টার হয়ে গেছে। আমার তো তখন গর্বে আর ধরে না। শুনলাম অশোকের প্রথম ছবি 'জীবন নাইয়া' খাণ্ডোয়ার সিনেমা হলে আসছে। বন্ধুদের সাথে ঠিক করলাম ছবি দেখতে যাব। সেই সময় আমাদের প্রিয় অভিনেতা ছিল 'মাষ্টার বিট্‌ঠল'। আরও কয়েকজন ছিল যাদের পর্দায় খুব মারামারি করতে দেখে ভালো লাগত। প্রথমে শোয়েই অশোকের ছবি দেখতে গেলাম দলবল নিয়ে। ছবি শেষ হওয়ার পর যখন সবাই হলের বাইরে এলাম বন্ধুদের মুখ দেখে বুঝলাম ছবি তাদের মোটেই ভালো লাগেনি। কি করে লাগবে? আমরা তো ভেবেছিলাম অশোককে আমাদের পছন্দের 'ফাইটিং হিরো'র মত দেখবো, কিন্তু ছবিতে সে তো একবারের জন্যও হাত তো তোলেই নি, উল্টে একজন তাকে গালে চড়িয়ে দিল। সেই রাতেই আমি অশোককে চিঠি লিখলাম যে পরের ছবিতে একটু আধটু হাত না চালালে খাণ্ডোয়ার অনেকগুলো 'ফ্যান'কে সে হারাবে।

পড়াশোনায় খুব আগ্রহ না থাকলেও ভালোভাবেই পাস করে যেতাম। তবে অঙ্কটাকে আমি কিছুতেই বাগে আনতে পারতাম না। পরীক্ষায় এই একটা জায়গায় আমি আটকে যেতাম। পাঁচ ক্লাসের 'ফাইনাল' পরীক্ষায় একটা অঙ্কও করতে পারলাম না। কিন্তু খাতায় তো কিছু লিখতে হবে। তাই খাতার 'মার্জিন' করলাম ছোট ছোট মুখ এঁকে। কিছু হিজিবিজি কবিতা লিখে, কয়েকটা অঙ্ক যা তা ভাবে করে পাতা ভরিয়ে খাতা জমা দিয়ে দিলাম। পরীক্ষা শেষ হতে সবাই বাইরে এল। আমার এক বন্ধু খুব ভালো অঙ্ক করতে পারত, তাকে বললাম একটা কাগজে সব অঙ্কগুলো আমাকে করে দিতে। একটা কাগজে সে সব অঙ্ক করে দিল। বাড়িতে ঢুকতেই বাবার তলব, 'পরীক্ষা কেমন হল?' একেবারে বাধ্য ছেলের মত বললাম খুব ভালো হয়েছে আর সব অঙ্ক আমি একটা কাগজে করে এনেছি বলে কাগজটা হাতে দিলাম। বাবা একটা করে অঙ্ক দেখছেন আর হাসি চওড়া হচ্ছে। বাবা নিশ্চিন্ত হলেন যে আমি খুব ভালো নম্বরই পাব। আলো সব ব্যাপারটা দেখে ঠিক সামলাতে পারল না। ও জানে আমি অঙ্কে কেমন, আমার পক্ষে এটা মোটেই সম্ভব নয়। ও বাবাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল যে আমি মিথ্যে বলছি, এও বলল যে আমায় আবার পরীক্ষা নিতে, কিন্তু বাবা তখন ছেলের প্রতিভায় এতটাই বিভোর যে তাঁর বিশ্বাস কেউ একটুও টলাতে পারল না।

রেজাল্ট না বেরোনো পর্যন্ত দিনগুলো দারুন কাটতে লাগল। রেজাল্ট বের হওয়ার দিন কয়েক আগে এক সকালে দেখলাম অঙ্কের 'মাষ্টার' আমাদের বাড়ির দিকেই আসছেন। বুঝলাম আজ আর রক্ষে নেই। আগেভাগেই জানালার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। বাবা মাষ্টারজীকে ভেতরে এনে বসালেন। তিনি বাবাকে একতাড়া কাগজ দিয়ে বললেন সেগুলো একটু দেখে দিতে। বাবা খাতা দেখতে লাগলেন, অঙ্ক ছাড়া অন্য সব বিষয়ে যেহেতু ভালোই পরীক্ষা দিয়েছি তাই সেগুলো নিয়ে সমস্যা ছিল না। সমস্যা হল অঙ্ক খাতা হাতে আসতেই। পরীক্ষার এরকম আজগুবি উত্তরপত্র দেখে বাবা তো ভীষণ চটে গেলেন। রাগে গরগর করতে করতে বললেন, 'এমন গাধা আর দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না। এ কি করতে স্কুলে যায়? একটা কিচ্ছুতো শেখে নি। মাষ্টারজী, আপনি এক্ষুনি এই ছেলের বাবা মাকে ব্যাপারটা জানান।' আমি আর সময় নষ্ট না করে বাড়ি থেকে চম্পট দিলাম। অনেক রাতে বাবার রাগ কমার পর বাড়ি ফিরলাম।

আমি আর আলো ইন্দোরে একই কলেজে পরতাম। হস্টেলে আমরা একই ঘরে থাকতাম। কলেজে থাকার সময় আমি পাজাম আর কালো 'ওভারকোট' পরতাম। সঙ্গে গলায় মাফলার আর পায়ে স্যাণ্ডেল। আমি প্রচণ্ড রোগা ছিলাম বলে কখনও 'ওভারকোট' না পরে কলেজে যেতাম না। শীত-গ্রীষ্ম কোট পরে থাকতে দেখে কেউ প্রশ্ন করলে বলতাম এটা আমার খুব লাকি 'ওভারকোট', তাই কখনো এটাকে গা ছাড়া করি না। ক্লাসের সময় 'ওভারকোট' তবু চলছিল, গোল বাধল ফুটবল কেলতে গিয়ে। সকলে সমস্বরে বলল কোট না খুললে আমায় ফুটবল খেলতে নেওয়া হবে না। অগত্যা মাঠের বাইরে তেকে খেলা দেখতে হচ্ছে। হঠাৎই খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পরায় বদলি খেলোয়াড় দরকার। যারা আমায় কেলতে বাধা দিচ্ছিল এবার তাদের অনুরোধেই 'ওভারকোট' পরে খেলতে নামলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে গোলও করে ফেললাম। জীবনে প্রথমবার কোট পরা ফুটবলারকে গোল করতে দেখে দর্শকদের উৎসাহ তো বহুগুণ বেড়ে গেল। আমার এই কোট এমন জনপ্রিয় হয়ে গেল যে এর সুবাদে আমি দৌড় প্রতিযোগিতাতেও কোট পরেই অংশগ্রহন করতে পেলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই সকলে জেনে যায় যে আমি অশোক কুমারের ভাই এবং গান গাইতে পারি। তাই কলেজের 'ফাংশান'-এ আমায় গান গাওয়াবার জন্য বন্ধুরা জোরাজুরি করতে থাকে। এর আগে কোনোদিন এত লোকের সামনে গাইনি। আমি বেশ 'নার্ভাস' হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত পর্দার পিছন থেকে গান গাইব এমন শর্তে সবাই রাজি হতে গান গাইতে উঠলাম। গান গাইতে গিয়ে ভয়ের চোটে একটু চড়া 'স্কেল'-এ গান ধরে ফেলেছি, তার ওপর কিছুটা গাওয়ার পরই মঞ্চের পর্দাও উঠে যায়। ভয়ে লজ্জায় দু চোখ জলে ভরে উঠল। তাতে অবশ্য সুবিধাই হল, আমি আর শ্রোতাদের দেখতে পেলাম না, কোনোক্রমে গান শেষ করলাম। যদিও সকলে বলল খুব ভাল গান হয়েছে।

কলেজ হস্টেলে আমার আর আলোর দুটো হারমোনিয়াম ছিল। প্রতিরাতে কয়েকজন ছাত্রবন্ধু চলে আসত আমাদের ঘরে, তারপর সবাই মিলে গান হত। অন্য গানের থেকে অবশ্য কাওয়ালি ধরনের গান, যাতে খুব চিৎকার করা যায়, বেশী হত। এম.এ. ক্লাসের এক ছাত্রের নালিশ পেয়ে একদিন হস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমাদের ঘরে চলে আসেন রোজকারের এই চিৎকার বন্ধ করাতে। কিন্তু তিনিও আমাদের গানের ভক্ত হয়ে গেলেন। এবার তিনি শ্রোতা হয়ে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলেন। ছাত্রটি সুবিচার না পেয়ে খবরের কাগজে ঘটনাটি জানিয়ে দেয় এবং সেটি খবর হয়ে ছেপে বের হয়। প্রতিশোধ নিতে সেদিন রাতেই এক ছাত্র-কবিকে দিয়ে ঐ ছাত্রের নামে উর্দু কবিতা লিখিয়ে ত্রিশজন একসাথে কাওয়ালি গাইলাম।

কলেজে 'সেকেণ্ড ইয়ার' পর্যন্ত পড়ে আর ভাল লাগল না। পড়া ছেড়ে বম্বে চলে এলাম। আমি 'প্লেব্যাক-সিঙ্গার' হব ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমি তখন ফিল্ম জগতে একেবারে অনভিজ্ঞ আর 'প্লেব্যাক-সিঙ্গার' হওয়ার জন্য 'স্ট্রাগল' করছি বম্বে টকিজে কাজ করার সূত্রে 'জিদ্দি' ছবিতে প্রথম 'প্লেব্যাক' করার সুযোগ পেলাম।

সেটা ১৯৪৯ সাল। আমার বড় ভাই অশোক বম্বে টকিজের 'মহল' ছবিতে কাজ করছে। সেদিন রাতের শিফটে শুটিং। তখন রাতের বেলা স্টুডিওর চারপাশটা এত ফাঁকা আর থমথমে হয়ে থাকত যে ভুতুড়ে পরিবেশ মনে হত। আমি স্টুডিও থেকে একটা অদ্ভুতুড়ে মুখোশ জোগাড় করলাম। তারপর সেটা মুখে দিয়ে মধুবালার 'মেকআপ রুম'-এ যাওয়ার রাস্তায় অন্ধকারে লুকিয়ে রইলাম। মধুবালাকে আসতে দেখে আমি একলাফে তার সামনে এসে মুখ দিয়ে নানা রকম আওয়াজ করতে শুরু করেদিলাম। মধুবালা ভয়ে এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে স্টুডিওর সকলে ছুটে এল। সবার আগে আশোক। আমি ততক্ষণে মুখোশ খুলে ফেলে খুব হাসছি, অশোক আমাকে দেখে এত রেগে গেল যে আমায় স্টুডিও থেকে বেরিয়ে যেতে বলল।

স্টুডিওর বাইরে এসে দেখলাম কোথাও যাওয়ার নেই। পথঘাট খাঁ খাঁ করছে। অগত্যা আবার স্টুডিওতে ফিরে এলাম। মধুবালার 'মেকআপ রুম' ছিল সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে। আমি ঐ সিঁড়ির নিচের দিকে ধাপে বসে রইলাম। হঠাৎ আবার মধুবালার চিৎকার, আগের বারের মতই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে দেখি আমার সেই মুখোসটা পরে কেউ একজন ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু মুখোসের আড়ালে কে? লোকটি যখন মুখোশ খুলল তখন সবাই অবাক হয়ে গেলাম, স্বয়ং অশোক।

এই বম্বে টকিজের 'মিউজিক রুম'-এ রুমার সঙ্গে আমার পরিচয়। রুমা তখন বম্বে টকিজের বাংলা 'সমর' আর হিন্দী 'মশাল' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় কাজ করছে। শুটিং থেকে ফাঁক পেলেই 'মিউজিক রুম'-এ চলে আসত। পরিচয় থেকে পরিণয় হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ আমরা বিবাহ করলাম যদিও আমার পরিবার এই বিয়ে মেনে নেয়নি। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান আর রুমা ব্রাহ্ম অই বাবা রাজি হননি। বাবা রাজি নয় বলে অশোকও আমায় 'বম্বে টকিজ' থেকে ছাঁটাই করে। যাই হোক পরে সব অবশ্য মিটে যায়। ১৯৫৪ সালে আমি আর রুমা একটা ছবির 'আউটডোর শুটিং' করতে দার্জিলিং যাই। আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে প্রতিদিন এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগেকে যেতে দেখতাম। একদিন সকালে কেটা দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনছি, হঠাৎ দেখি তেনজিংও সেই দোকানেই আসছে। আমাদের অবাক করে তেনজিং দোকানদারকে অনুরোধ করল আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমরা একসাথে ছবি তুললাম, চা খেলাম।

ডায়েরিতে এমন কত যে ঘটনা লেখার আছে — ছেলেবেলার ঘটনা, হারানো ভালোবাসার সুবাস, জীবনের পথে নানা দিকে ছড়িয়ে যাওয়া বন্ধুরা। বন্ধু বলতেই অকাল প্রয়াত অরুণ কুমারের ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। একমাত্র অরুণই আমায় গায়ক হওয়ার সাহস যোগাত। আমার ওপর, আমার প্রতিভার ওপর ওর অগাধ আস্থা ছিল। এখন তো দেখছি লেখা শেষ করাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তাই ডায়েরিটা শেষ করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল এটাকে অসমাপ্তই রেখে দেওয়া।

কিশোরকুমারের লেখা *'Leaves from my non-existent Diary'* -এর অনুবাদ (সংক্ষেপিত)

কিশোর কুমার অভিনীত চলচ্চিত্র

(সাদা-কালো এবং রঙিন ০)

সংখ্যা	সাল	ছবির নাম	পরিচালক	সুরকার	নায়িকা / সহ অভিনেত্রী
১	১৯৪৬	শিকারী	সবক ওয়াচা	শচীন দেববর্মন	—
২	১৯৪৭	শেহনাই	পি. এল. সন্তোষী	রামচন্দ্র চিতলকর (সি. রামচন্দ্র)	—
৩	১৯৪৮	সতী বিজয়	কে. জে. পারমার	শান্তিকুমার দেশাই	—
৪	১৯৪৮	জিদ্দি	শাহীদ লতিফ	খেমচাঁদ প্রকাশ	—
৫	১৯৪৯	কানিজ	কৃষ্ণ কুমার	গুলাম হায়দার-হন্সরাজ বহল	—
৬	১৯৫০	মুকাদ্দার	অরবিন্দ সেন	খেমচাঁদ প্রকাশ-ভোলা শ্রেষ্ঠ-জেমস সিং	রজনী
৭	১৯৫১	আন্দোলন	ফণী মজুমদার	পান্নালাল ঘোষ	মঞ্জু
৮	১৯৫২	ছম্ ছমা ছম্	পি. এল. সন্তোষী	ও. পি. নাইয়ার	মঞ্জু
৯	১৯৫২	তামাশা	ফণী মজুমদার	খেমচাঁদ প্রকাশ-মান্না দে-এস.কে.পাল	রেহানা
১০	১৯৫৩	ফরেব	শাহীদ লতিফ - ইশমত চুঘতাই	অনিল বিশ্বাস	শকুন্তলা
১১	১৯৫৩	লড়কি	এম. ভি. রামণ	আর.সুদর্শনম-ধনীরাম-সি.রামচন্দ্র	বৈজয়ন্তিমালা
১২	১৯৫৩	লহেরেঁ	এন. এস. রাওয়েল	রামচন্দ্র চিতলকর (সি. রামচন্দ্র)	শ্যামা
১৩	১৯৫৪	অধিকার	মোহন সায়গল	অবিনাশ ব্যাস	ঊষা কিরণ
১৪	১৯৫৪	ধোবি ডক্টর	ফণী মজুমদার	খৈয়াম	ঊষা কিরণ
১৫	১৯৫৪	ইলজাম	আর. সি. তলোয়ার	মদন মোহন	মীনা কুমারী
১৬	১৯৫৪	মিস মালা	জয়ন্ত দেশাই	চিত্রগুপ্ত	বৈজয়ন্তীমালা
১৭	১৯৫৪	নকরী	বিমল রায়	সলিল চৌধুরী	সৈলা রামানী
১৮	১৯৫৪	পহেলী ঝলক	এম. ভি. রমল	রামচন্দ্র চিতলকর (সি. রামচন্দ্র)	বৈজয়ন্তীমালা
১৯	১৯৫৪	তিন তসবিরেঁ	এস. এস. সোলাঙ্কি	নীনু মজুমদার	—
২০	১৯৫৫	বাপ রে বাপ	এ. আর. করদার	ও. পি. নাইয়ার	চাঁদ উসমানি
২১	১৯৫৫	চার পয়সে	এন. এইচ. জিরি	বি. ডি. বর্মন	নিম্মী
২২	১৯৫৫	মদভরে নৈঁন	হেম চন্দ্র	শচীন দেববর্মন	বীণা রায়
২৩	১৯৫৫	রুকসানা	আর. সি. তলয়ার	সাজ্জাদ হুসেন	মীনা কুমারী
২৪	১৯৫৬	আব্রু	চতুর্ভুজ দেশাই	বুলো সি. রাণী	কামিনী কৌশল
২৫	১৯৫৬	ভাগম্ভাগ	ভগবান	ও. পি. নাইয়ার	শশীকলা
২৬	১৯৫৬	ভাই ভাই	এম. ভি. রামণ	মদন মোহন	নিম্মী
২৭	১৯৫৬	মেমসাহেব	আর. সি. তলোয়ার	মদন মোহন	মীনা কুমারী
২৮	১৯৫৬	ঢাকে কি মলমল	জে. কে. নন্দা	ও. পি. নাইয়ার-রবিন চ্যাটার্জী	মধুবালা
২৯	১৯৫৬	পরিবার	অসিত সেন	সলিল চৌধুরী	ঊষা কিরণ
৩০	১৯৫৬	প্যায়সা হি প্যায়সা	মেহরীশ	অনিল বিশ্বাস	শাকিলা, মালা সিনহা
৩১	১৯৫৬	নয়া আন্দাজ	কে. অমরনাথ	ও. পি. নাইয়ার	মীনা কুমারী
৩২	১৯৫৬	নিউ দিল্লী	মোহন সায়গল	শঙ্কর জয়কিশন	বৈজয়ন্তীমালা
৩৩	১৯৫৭	আশা	এম. ভি. রামন	রামচন্দ্র চিতলকর (সি. রামচন্দ্র)	বৈজয়ন্তীমালা
৩৪	১৯৫৭	বন্দী	সত্যেন বোস	হেমন্তকুমার (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	মধুবালা
৩৫	১৯৫৭	বেগুনাহ্	নরেন্দ্র সুরী	শঙ্কর জয়কিশন	শাকীলা
৩৬	১৯৫৭	মিস মেরী	প্রসাদ	হেমন্তকুমার (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	যমুনা
৩৭	১৯৫৭	মুসাফির	হৃষিকেশ মুখার্জী	সলিল চৌধুরী	—
৩৮	১৯৫৮	চলতি কা নাম গাড়ি	সত্যেন বোস	শচীন দেববর্মন	মধুবালা
৩৯	১৯৫৮	চন্দন	এম. ভি. রামন	মদন মোহন	মধুবালা
৪০	১৯৫৮	দিল্লী কা ঠগ	এস. ডি. নারাং	রবি	নুতন
৪১	১৯৫৮	কভি আন্ধেরা কভি উজালা	সি. পি. দিক্ষিত	ও. পি. নাইয়ার	নুতন
৪২	১৯৫৮	রাগিনী	রাখন	ও. পি. নাইয়ার	পদ্মিনী, জবিন
৪৩	১৯৫৯	চাচা জিন্দাবাদ	ওম প্রকাশ	মদন মোহন	অনিতা গুহ
৪৪	১৯৫৯	জাল সাজ	অরবিন্দ সেন	দত্তা নায়েক (এন. দত্তা)	মালা সিনহা
৪৫	১৯৫৯	শারারত	এইচ. এস. রাওয়েল	শঙ্কর জয়কিশন	মীনা কুমারী
৪৬	১৯৬০	আপনা হাত জগন্নাথ	মোহন সেহগল	শচীন দেববর্মন	সৈদা খান
৪৭	১৯৬০	বেওকুফ	আই. এস. জোহর	শচীন দেববর্মন	মালা সিনহা
৪৮	১৯৬০	গার্ল ফ্রেণ্ড	সত্যেন বোস	হেমন্তকুমার (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	ওয়াহিদা রহমান
৪৯	১৯৬০	মহেলোঁ কি খাব	হায়দার	হেমন্তকুমার (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	মধুবালা

কিশোর কুমার অভিনীত চলচ্চিত্র

(সাদা-কালো এবং রঙিন ০)

সংখ্যা	সাল	ছবির নাম	পরিচালক	সুরকার	নায়িকা / সহ অভিনেত্রী
৫০	১৯৬১	কড়োরপতি	মোহন সেহগল	শঙ্কর জয়কিশন	শশিকলা, কুমকুম
৫১	১৯৬১	ঝুমরু	শঙ্কর মুখার্জী	কিশোরকুমার	মধুবালা
৫২	১৯৬২	বম্বে কা চোর	এস. ডি. নারাঙ	রবি	মালা সিনহা
৫৩	১৯৬২	হাফ টিকিট	কালীদাস	সলিল চৌধুরী	মধুবালা
৫৪	১৯৬২	মন মৌজি	কৃষ্ণন -পাঞ্জু	মদন মোহন	সাধনা
৫৫	১৯৬২	নটি বয়	শক্তি সামন্ত	শচীন দেববর্মন	কল্পনা
৫৬	১৯৬২	রঙ্গোলী	অমর কুমার	শঙ্কর জয়কিশন	বৈজয়ন্তীমালা
৫৭	১৯৬৩	এক রাজ	শক্তি সামন্ত	চিত্রগুপ্ত	কল্পনা
৫৮	১৯৬৪	বাগী শেহজাদা	মারুতি	বিপিন দত্ত	কুমকুম
৫৯	১৯৬৪	ডাল মে কালা	সত্যেন বোস	রামচন্দ্র চিতলকর (সি. রামচন্দ্র)	নিম্মী
৬০	১৯৬৪	দুর গগন ছাঁয়ো মেঁ	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	সুপ্রিয়া চৌধুরী
৬১	১৯৬৪	গঙ্গা কি লহেঁরেঁ ০	দেবী শর্মা	চিত্রগুপ্ত	কুমকুম
৬২	১৯৬৪	মিস্টার এক্স ইন বম্বে	শান্তিলাল সোনী	লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল	কুমকুম
৬৩	১৯৬৫	হাম সব উস্তাদ হ্যায়	মারুতি	লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল	অমিতা
৬৪	১৯৬৫	শ্রীমান ফান্টুস	শান্তি লাল সোনী	লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল	কুমকুম
৬৫	১৯৬৬	অকলমন্দ	রূপ কে. শোরি	ও. পি. নাইয়ার	সোনিয়া সাহনি
৬৬	১৯৬৬	দেবর	মোহন সেহগাল	রোশন	মুমতাজ
৬৭	১৯৬৬	লড়কা লড়কি	সোম হক্সার	মদন মোহন	মুমতাজ
৬৮	১৯৬৬	পেয়ার কিয়ে জা ০	শ্রীধর	লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল	কল্পনা
৬৯	১৯৬৭	আলবেলা মস্তানা ০	বি. জে. প্যাটেল	দত্তা নায়েক (এন. দত্তা)	আশা নাদকার্নী
৭০	১৯৬৭	দুনিয়া নাচেগি	কে. পারভেজ	লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল	কুমকুম
৭১	১৯৬৭	হাম দো ডাকু	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	গঙ্গা
৭২	১৯৬৮	দো দুনি চার	দেবু সেন	হেমন্তকুমার (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	তনুজা, সুরেখা
৭৩	১৯৬৮	হায় মেরা দিল ০	বেদ-মদন	ঊষা খান্না	কুমকুম
৭৪	১৯৬৮	পড়োশন ০	জ্যোতি স্বরূপ	রাহুল দেববর্মন	—
৭৫	১৯৬৮	পায়েল কি ঝঙ্কার ০	এম. ভি. রামন	রামচন্দ্র চিতলকর (সি. রামচন্দ্র)	জ্যোতি লক্ষ্মী
৭৬	১৯৬৮	সাধু অউর শয়তান ০	এ. ভিম সিং	লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল	—
৭৭	১৯৬৮	শ্রীমানজি	রামদয়াল	ও. পি. নাইয়ার	শাহীদা
৭৮	১৯৭০	আঁশু অউর মুশকান ০	পি. মাধবন	কল্যাণজী-আনন্দজী	—
৭৯	১৯৭১	দুর কা রাহী	কিশোর কুমার	কিশোর কুমার	তনুজা
৮০	১৯৭১	হাঙ্গামা	এস. এম. আব্বাস	রাহুল দেববর্মন	হেলেন
৮১	১৯৭১	ম্যাঁয় সুন্দর হুঁ ০ (অতিথি)	কৃষ্ণন -পাঞ্জু	শঙ্কর-জয়কিশন	—
৮২	১৯৭২	বম্বে টু গোয়া ০ (অতিথি)	এস. রামানাথন	রাহুল দেববর্মন	—
৮৩	১৯৭২	প্যায়ার দিওয়ানা ০	সমর চ্যাটার্জী	লালা-সত্তার	মুমতাজ
৮৪	১৯৭৪	বাড়তি কা নাম দাড়ি ০	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	শীতল
৮৫	১৯৭৫	লাভ ইন বম্বে ০	সমু মুখার্জী	শঙ্কর-জয়কিশন	—
৮৬	১৯৭৮	এক বাপ ছে বেটে ০(অতিথি)	মেহমুদ	রাজেশ রোশন	—
৮৭	১৯৭৮	শাবাস ড্যাডি ০	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	যোগিতা বালি
৮৮	১৯৮১	চলতি কা নাম জিন্দেগি ০	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার	বিজয়া, রীতা ভাদুড়ি
৮৯	১৯৮২	দুর বাদিয়োঁ মেঁ কাঁহি ০	কিশোরকুমার	কিশোরকুমার (পার্শ্ব-সঙ্গীত)	শ্যামলী
	বাংলা ছবি				
১	১৯৫৮	লুকোচুরি	কমল মজুমদার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মালা সিনহা, অনিতা গুহ
২	১৯৬১	মধ্যরাতের তারা	পিনাকি মুখার্জী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	—
৩	১৯৬৫	একটুকু ছোঁয়া লাগে	কমল মজুমদার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	আজরা
৪	১৯৬৭	দুষ্টু প্রজাপতি	শ্যাম চক্রবর্তী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	তনুজা

এছাড়াও কিশোরকুমার অভিনীত নয়টি হিন্দী ছবি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। যার মধ্যে ছয়টি ছিল কিশোরকুমারের নিজস্ব প্রোডাকশনের। এই ছয়টি ছবিরই সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কিশোরকুমার। একটি (***সুহানা গীত***) ছাড়া ছবিগুলির পরিচালক এবং প্রধান গায়ক ছিলেন তিনি। ছবিগুলি হ'ল ঃ ***নীলা আসমান*** (মধুবালা), ***সুহানা গীত*** (মধুবালা), ***ব্যাণ্ড মাস্টার চিক চিক বুম*** (শ্যামা,শাকীলা), ***দীনু কা দীননাথ, যমুনা কে তীর*** (যেগীতা বালী), ***প্যার আজনবী হ্যায়*** (লীনা চন্দ্রভারকর)। সুহানা গীত পরিচালনা করছিলেন ফণী মজুমদার। ফণী মজুমদার পরিচালত ***মা*** (কুমকুম), ভগবান পরিচালিত ***হঁসতে রহনা*** এবং ও.পি.দত্তা পরিচালত ***চট্টান*** (কল্পনা) ছবিগুলিও শেষ হয় নি।

আমাকে মজা দিতে বাবা অদ্ভুত সব কাণ্ড করত

অমিতকুমার

আমি পড়াশোনার জন্য মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকতাম কিন্তু আমার মন পরে থাকত বাবার কাছে। কলকাতা আমার একদম পছন্দের জায়গা ছিল না, কারণ এখানে তো বাবা নেই। স্কুলে গরমের বা দেওয়ালির ছুটি পরলেই আমি মুম্বই চলে যেতাম, বাবার কাছে। তখন মুম্বই আমার কাছে স্বর্গ মনে হত, ওখান থেকে আসতেই ইচ্ছা করত না। প্রতিবারই স্কুল শুরু হওয়ার আট দশ দিন পর আমি স্কুলে যেতাম প্রতিবার দেরী করে আসার জন্য মা খুব রাগ করত ঠিকই, কিন্তু বাবার আদর ছেড়ে আমার কলকাতায় আসতে একটুও ইচ্ছা করত না। সকালের ফ্লাইটে কলকাতা আসার জন্য ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখতাম বাবার চোখ জলে ভরে গেছে, বাবা খুব কষ্ট পাচ্ছে।

আমি যখন সাউথ পয়েন্টে ক্লাস সিক্সে পড়িবাবা দুদিনের কাজে কলকাতা এসেছিল। সেই দু'দিন আমি দারুন মজায় কাটিয়েছিলাম। দুজনে নানা যায়গায় ঘুরলাম, আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বাবা হোটেলে চলে গেল। যাওয়ার সময় আমার কাছে পরের দিন আমার কি কাজ জানতে চাইলে বললাম ১১টা থেকে ৪টা স্কুলে থাকব। শুনে বলল বিকালে আমায় ডেকে নেবে। পরদিন স্কুলে বেশ অনেকগুলো পিরিয়ড হওয়ার পর আমার এক বন্ধু আমায় জানাল যে বাবা এসেছে প্রিন্সিপালের কাছে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা স্কুল জেনে গেল কিশোরকুমার এসেছে। সবাই ক্লাস ছেড়ে করিডরে এসে ভিড় করেছে। আমি প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে দেখি বাবা বসে আছে। আমায় বলল, 'কেমন! চমকে দিলাম তো?' আমাকে মজা দিতে বাবা এমন অদ্ভুত সব কাণ্ড করত।

কলকাতায় আসার আগে আমরা থাকতাম সাকসেরিয়া কলোনিতে। এখন সেখানে হোটেল হরাইজন হয়েছে। বাবা আমার জন্মদিন খুব ধুমধাম করে আয়োজন করত। দেবসাব, প্রেমনাথজী, রাজ কাপুরজীর বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা আসত। বাবা আমাদের ওয়াল্ট ডিজনীর কার্টুন ছবি দেখাত। বাবা আমাকে একটা ১৬ মিলিমিটার প্রজেকশন উপহার দিয়েছিল। সেটা দিয়ে বাড়িতে সিনেমা দেখতাম। বাবার ছবিগুলোই বেশি করে দেখতাম। তার মধ্যে 'বাপ রে বাপ' ছবিটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। পরে তো বাবার সঙ্গে অনেক ছবিতে আমি অভিনয় করেছি, সে সব খুব মজার স্মৃতি, সারা জীবন মনে থাকবে।

বাবার সঙ্গে কত যে মজার স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে শেষ হবে না। সি.রামচন্দ্র, সুন্দর, বি.এন.শর্মা আর ওমপ্রকাশ ছিলেন বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দেখা হলেই এঁরা নিজেদের মধ্যে একটা অদ্ভুত কথা বলতেন — 'বড়িয়া খালে কারারি গজক'। একজন এটা বললে অন্যজনকেও এটা বলে জবাব দিতে হত, না দিলে ১০০টাকা ফাইন। এমনই নিয়ম ছিল। ওমপ্রকাশজী তাঁর 'চাচা জিন্দাবাদ' ছবির কাজ নিয়ে কোনো কারনে খুব রেগে গেছেন, সকলকে খুব বকাবকি করছেন, সেই সময় বাবা সেটে এসে সব শুনে ওই অদ্ভুত কথাটা বলতেই ওমপ্রকাশজীও সেটার জবাব দিলেন। রাগ তখনকার মত উধাও হল ঠিকই কিন্তু বাবা সেট থেকে যেতেই আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলেন।

বাবার সঙ্গে সবচেয়ে মজার সম্পর্ক ছিল শচীনকর্তার। অনেকবার দুজনের নানান মজাদার কীর্তির সাক্ষী হয়েছি। শচীনকর্তা তখন লিংকিং রোডের জেট বাংলোয় থাকেন। একটা গানের রিহার্শালের জন্য একদিন সকালে বাবার সঙ্গে সেখানে গেছি। বাংলোর সামনে পৌঁছে দেখি শচীনকর্তা দেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে হেসে ভিতরে চলে গেলেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, বেস অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও দরজা খুলল না। বাবা তখন অধৈর্য্য হয়ে চিৎকার করতে ভিতর থেকে কর্তার গলা শোনা গেল, 'তুই তো বেল বাজাসনি, তুই বেল বাজা আমি গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি।'

বাবা প্রথম স্টেজ শো করে কলকাতায়, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। আমি, বাবা, মেহমুদ আর পঞ্চমদা একসাথে গাড়িতে করে সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম। বাবা প্রথমে বেশ নার্ভস ছিল। কিন্তু মঞ্চে উঠে প্রচুর দর্শক আর তাদের উন্মাদনা দেখে আনন্দে কীর্তণের সুরে বাবা গেয়ে উঠল, 'বাবারা মায়েরা, দাদারা দিদিরা, দাদুরা দিদারা এবং প্রেমী প্রেমীকারা, আপনাদের সাথে আমার এই প্রথম দেখা।' এরপর থেকে এই গানটা গেয়েই বাবা মঞ্চের অনুষ্ঠান শুরু করত। মঞ্চে আমি বাবার গানের সঙ্গে বাজনা বাজাতাম। বাবাই আমাকে দিয়ে মঞ্চে গান গাওয়ায়। বাবার সঙ্গে একই মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে পারাটা যেমন বিরাট সৌভাগ্যের তেমনি বাবার অনুষ্ঠান দেখাটাও একটা অভিজ্ঞতা। বাবর মত দর্শক মাতাতে আর কাউকে দেখিনি।

আমার গানকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে কিশোরদা

রাহুল দেববর্মন

১৯৫২ সালে আমি কলকাতা থেকে মুম্বাই এলাম বাবার কাছে। আমার বয়স তখন এই বারো-তেরো। কারদার স্টুডিওতে বাবার একটা গানের রেকর্ডিং ছিল। বাবার সঙ্গে আমিও গেলাম। স্টুডিওতে ঢোকার সময় দেখলাম কুর্তা-পাজামা পরা গলায় মাফলার জড়ানো একটা লোক স্টুডিওর পাঁচিলের ওপর বসে আছে। বাবা স্টুডিওর ভেতরে চলে গেলেও আমি লোকটাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি ওখানে বসে কী করছেন?' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল 'আমি কারদার সাহেবকে নকল করছি।' আমি তাকে নাম জিজ্ঞাসা করতে পা দুটোকে জোরে জোরে দোলাতে দোলাতে বলল 'কিশোরকুমার খাণ্ডালাওয়ালা।' এই দোলানিতে তার এক পায়ের জুতো নিচে পড়ে গেল। আমায় বলল সেটা তুলে দিতে। আমি জুতোটা তুলে দিতে আমায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, *সাধু*।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি অশোককুমার খাণ্ডালাওয়ালার ভাই?' বললেন, 'ঠিকই ধরেছো কিন্তু তা বলে ভেবো না সবাই আমাকে কাজ দেয়।' আমি পরিচয় দিয়ে বললাম, 'আমার নাম পঞ্চম।' শুনে বলল, 'তোমার এই পঞ্চম নামটা কে রেখেছে আমি জানি। আমার দাদা অশোককুমার তো?' বলেই আমার বাবা আর অশোককুমারের গলা করে কথা বলতে লাগলেন। আমার তো হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাওয়ার জোগাড়। বললেন, 'আমি ডক্টর জেকিল আর মিষ্টার হাইড। রোজ রাতে আমি অন্য লোক হয়ে যাই।' কিশোরদার সঙ্গে আমার সেই প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ।

এরপর কারদার স্টুডিওতে কিশোরদার সাথে প্রায় দেখা হতে লাগল। বয়সে আমার থেকে দশ বছরের বড় হলেও আমরা দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুহয়ে গেলাম। কিশোরদার 'মিমিক্রি' আমার খুব ভালো লাগত। সায়গলের প্রচণ্ড ভক্ত ছিল, যখন সায়গলকে নকল করত তখন তার হাঁটাচলা, কথাবলা সব বদলে যেত। যেন স্বয়ং কুন্দনলাল সায়গল হয়ে যেত। সাবলীলভাবে সায়গলের গাওয়া বিখ্যাত 'ম্যাঁয় ক্যা জানু ক্যা জাদু হ্যায়' গানটা গেয়ে শোনাত। আমি 'নওজয়ান' ছবিতে বাবার সহকারী হিসাবে কাজ শুরু করি। ছবিতে কিশোরদার গাওয়া দুটো 'ডুয়েট' গান ছিল। একটা সামসাদ বেগমের সঙ্গে অন্যটা লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে। সেই সময় পুরো গান একবারে 'রেকর্ডিং' হত। রেকর্ডিংয়ের সময় দেখতাম গানের মুখড়া আর অন্তরার মাঝে যন্ত্রশিল্পীরা যখন তাদের সুর বাজাতেন তখন কিশোরদাকে দেখতাম আসে পাশের কারোর না করোর সাথে কথা বলতে বা কিছু অঙ্গি ভঙ্গি করতে লেগেছে। কিন্তু অন্তরা শুরু করতে বা ঠিক জায়গায় গান ধরতে কখনও ভুল হতে দেখিনি। কিন্তু কিশোরদাকে দেখতে গিয়ে ভুল করে ফেলত যন্ত্রশিল্পীরাই। 'চলতি কা নাম গাড়ি'র মত ছবি আর হয়নি। বাবা এই ছবির সুরকার আর আমি ছিলাম সহকারী। এই ছবির প্রতিটি গান তৈরীতেই কিশোরদার অবদান আছে। কোনও মুখরা আবার কোনো গানের অন্তরা কিশোরদারই সুর কার। এখন আর আলাদা করে গান ধরে মনে নেই কোনটা কার করা তবে 'পাঁচ রুপাইয়া বারা আনা' গানটা পুরোটাই কিশোরদার ভাবনা। ছবির শুটিংয়ের সময়ও কিশোরদা নানা রকম ভাবনা যোগাতো পরিচালক সত্যেন বোসও সে সব মেনে নিতেন।

১৯৬৫ সালে কিশোরদার সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে প্রথম কাজ করি 'ভূত বাংলা' ছবিতে। তারপর পড়োসন, কাটিপতঙ্গ, অমর প্রেম, শোলে, আজাদ, কুদরত — কত নাম করবো। অসাধারণ সব গান গেয়েছেন। আমি দেখতাম কিশোরদাকে রেকর্ডিংয়ের দিন তিনেক আগে গানের টেপ পাঠিয়ে দিলে গানটাকে কিশোরদা অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিত। আসলে পুরো সুরটাকে আত্মস্থ করে নিত। কিশোরদার কাছে এটা শুধু গান গাওয়া ছিল না, রেকর্ডিংয়ে পৌঁছনোর আগে গানটাকে ঠিকভাবে বুঝে নিতে, অনুভব করতে, প্রয়োজনীয় ভাবনা চিন্তা করেতে চাইত। এই সময়টুকু কিশোরদাকে দিতে পারলে রেকর্ডিংয়ের পর দেখতাম গানটা আমার ভাবনার থেকে কয়েক গুণ বেশী ভালো হয়েছে। আর সেটা সম্পূর্ণ কিশোরদার জন্যেই হয়েছে। তবে সবটাই নির্ভর করত কিশোরদার মুডের ওপর। একবারের কথা মনে পড়ছে, কিশোরদা আর লতাকে নিয়ে একটা গান রেকর্ডিং হবে। রিহার্শালের পর ফাইনাল রেকর্ডিং, আমি 'রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি ...' বলতেই 'মিউজিক' শুরু হল কিন্তু লতার কোনো আওয়াজ নেই। আমি ছুটে গেলাম 'সিঙ্গার্স কেবিন'-এ, গিয়ে কি দেখলাম! দেখি কি হাসির চোটে লতার প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম, আমায় দেখে বলল, 'হয় আজকের রেকর্ডিং বন্ধ কর না হলে কিশোরদাকে আধ ঘন্টা এই ঘরের বাইরে নিয়ে যাও।' আমি কিশোরদাকে বাইরে আসতে বললাম। কিন্তু আধ ঘন্টা অপেক্ষা করার ইচ্ছা কিশোরদার ছিল না, স্টুডিও থেকে কখন বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে গিয়েছে। পরে আমি জানতে পারি সেদিন কিশোরদার গান গাইতে ইচ্ছা করছিল না। তারপর থেকে কিশোরদার রেকর্ডিং থাকলে আমি স্টুডিওর লোকজনকে বলে দিতাম কিশোরদার ওপর নজর রাখতে। বলাতো যায়না আবার কখনও যদি হুট করে পালিয়ে যায়।

‘শিং নেই তবু নাম তার সিংহ’

১৯৮৫ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখের ‘দ্য ইলাস্ট্রেটেড ইউকলি অফ ইণ্ডিয়া’ পত্রিকার প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয় ছিলেন স্বয়ং কিশোরকুমার। পত্রিকায় কিশোরকুমারের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন পত্রিকার সম্পাদক প্রীতিশ নন্দী। কিশোরকুমার অকপটে তাঁর মনের কথা বলেছিলেন এই সাক্ষাৎকারে। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত নানা গল্পগাথারও ব্যখ্যা দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষের বাংলা তর্জমা তুলে ধরা হল ‘জেলার খবর সমীক্ষা’র পাঠকদের জন্য। আশাকরি অনেক ভুল ধারণার অবসান করবে এই লেখাটি।

অনেক লোকেরই ধারনা আপনি পাগল।

কে বলে আমি পাগল? আমি নই, গোটা দুনিয়াটাই পাগল।

কিন্তু লোকের এরকম ধারনা হওয়ার কারন তো আপনার অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা।

লোকের এমন ধারনাটা হয়েছে সেই মেয়েটার সাক্ষাৎকারের জন্য। আমি তখন একাই থাকি। সাক্ষাৎকার নিতে এসে আমায় একা দেখে মেয়েটি বলল, ‘আপনি নিশ্চয়ই খুব একা!’ আমি বললাম মোটেই তা নয়। চল তোমার সাথে আমার কয়েকজন বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিই। এই বলে আমি তাকে আমার বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার গাছ-বন্ধু জনার্দন, রঘুনন্দন, গঙ্গাধর, জগন্নাথ, বুদ্ধুরাম, ঝটপটঝটপট-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমি মেয়েটিকে বলেছিলাম এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এরাই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। মেয়েটি সাক্ষাৎকার ছাপার সময় মনগড়া উদ্ভট সব কথা লিখে দিল, আমি নাকি প্রতি সন্ধ্যায় গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরে অনেকটা সময় কাটাই। আপনি বলুন তো এতে অন্যায়টা কি আছে? গাছেদের বন্ধু মনে করাটা কি পাগলামি?

মোটেই না।

তারপর, একদিন একজন ‘ইন্টেরিয়র ডেকরেটর’ এল আমার কাছে। ঠা ঠা গরমকালে তিনি বাবু পশমের থ্রি-পিস স্যাভিল রো স্যুট পরে এসে আমাকে ‘এস্‌থেটিক্স, ডিজাইন, ভিজুয়াল সেন্স’ নিয়ে এক লম্বা ‘লেকচার’ দিল। প্রায় অধঘন্টা ধরে ওর অদ্ভুত আমেরিকান উচ্চারনে ‘লেকচার’ শোনার পর আমি তাকে বললাম আমার বসার ঘরটা খুব সাধারণ ভাবে সাজাতে চাই। ঘরের মধ্যে ফুট খানেক গভীর একটা ছোট্ট পুকুর থাকবে আর বসার সোফার বদলে তাতে নৌকা ভাসবে। মাঝখানে একটা জায়গা করে নোঙর দিয়ে আটকানো থাকবে যাতে তার ওপর চায়ের জিনিসপত্র রাখা যায়। চা খাওয়ার সময় সবাই নৌকা বেয়ে মাঝখানে চলে আসবে। তবে নৌকাগুলো যেন ঠিকমত ‘ব্যালান্স’ করে থাকে, নইলে কথা বলতে বলতে কারোর নৌকা শোঁ করে অন্য দিকে চলে যাবে। সে আমার দিকে অদ্ভুত মুখ করে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আমি কিভাবে দেওয়াল সাজাতে চাইছি শোনার পর তার মুখে রীতিমত আতঙ্ক ফুটে উঠল। আমি বলেছিলাম দেওয়ালে ছবির বদলে জ্যান্ত কাক, আর ছাদ থেকে পাখার বদলে একটা হনুমান ঝুলিয়ে রাখতে চাই। এটা শোনার পর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে সদর দরজার দিকে এমন জোরে দৌড় লাগালো যে ইলেকট্রিক ট্রেনও লজ্জা পাবে। এবার আপনিই বলুন, কেউ যদি হাঁসফাঁস করা গরমে পশমের থ্রি-পিস স্যুট গায়ে দিয়ে পাগল না হয়, তাহলে বসার ঘরের দেওয়ালে কাক ঝোলানোর কথা বললে আমায় কেন পাগল বলা হবে?

আপনার ভাবনাগুলো বেশ নতুন রকমের, কিন্তু আপনার ছবিগুলো ব্যবসা করতে পারে না কেন?

কারন আমি নিজেই আমার ডিস্ট্রিবিউটারদের বলি আমার ছবি এক সপ্তাহের বেশী হলে না চলে। এক সপ্তাহ হলেই যেন হল থেকে তুলে নেয়। একথা শোনার পর তারা আর কেউ আমার ঘরমুখো হয় না। আপনি আমার মতো প্রোডিউসার-ডাইরেক্টর আর একটাও পাবেন না যে নিজের বানানো ছবি আপনাকে এইজন্য ছুঁতে নিষেধ করবে যে সে কি বানিয়েছে তা তার নিজেরই বোঝার ক্ষমতা নেই।

তাহলে আপনি ছবি বানান কেন?

আমি ছবি তৈরীর উদ্দীপনাটা উপভোগ করতেই ছবি বানাই। তবে আমার মনে হয় আমি যেসব ছবিতে কিছু বলতে চেয়েছি সেই ছবিগুলো বেশ ভালো চলেছে। আমার বেশ মনে আছে, আমার দূর গগন কে ছাঁও মেঁ ছবিটা অলঙ্কার হলে

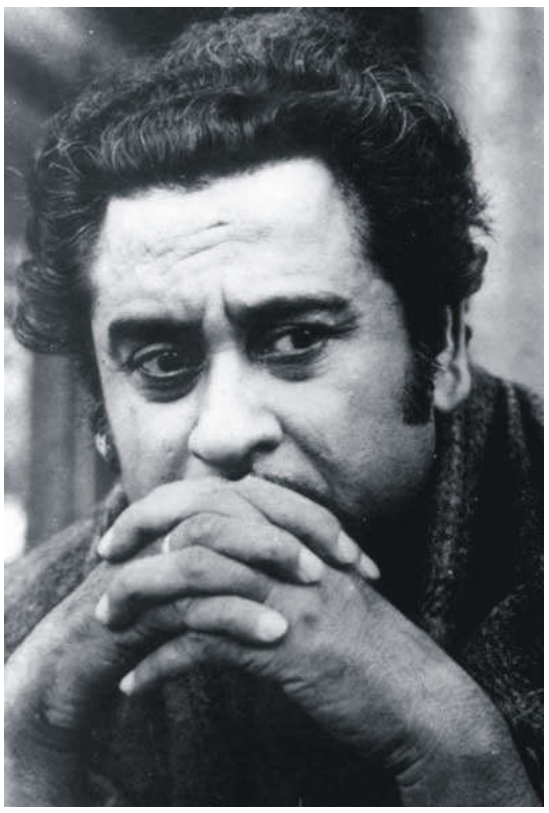

রিলিজ করেছিল। ছবি রিলিজের ব্যাপারটাও বেশ অদ্ভুত ছিল। আমার জামাইবাবুর ভাই সুবোধ মুখার্জি তাঁর ‘এপ্রিল ফুল’ ছবিটার জন্য ৮ সপ্তাহ ধরে অলঙ্কার হলটা বুক করে রেখেছিলেন। ‘এপ্রিল ফুল’ যে ব্লকবাস্টার হবে যে বিষয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই। আর আমার ছবি তো ফ্লপ হবেই তাই উনি তাঁর বুকিং-এর প্রথম সপ্তাহে আমার ছবি চালাতে দিলেন। বাকি সাত সপ্তাহে তাঁর ছবি রমরমিয়ে চলবে। প্রথম শো-এ মাত্র ১০ জন লোক আমার ছবি দেখতে এল। আমি সেই শো-এ হলের ভেতরে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য উপস্থিত ছিলাম। সুবোধবাবু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তা কোরো না, এসব তো হয়েই থাকে। কিন্তু কে চিন্তা করছে? তারপর, মুখে মুখে ছবির কথা ছড়াতে লাগল। দিন কয়েকের মধ্যেই ফাঁকা শো হাউসফুল হয়ে গেল। অলঙ্কারে টানা ৮ সপ্তাহ হাউসফুল শো চলল। সুবোধবাবু আমার ওপর অত্যন্ত চটে গেলেন কিন্তু আমি কি করে হল ছাড়ি? অলঙ্কারে ৮ সপ্তাহের বুকিং শেষ হওয়ারপর ছবি নিয়ে গেলাম সুপার-এ। সেখানে আরো ২১ সপ্তাহ চলল ছবিটা। সুবোধ মুখার্জির ‘এপ্রিল ফুল’ বিরাট ফ্লপ হল। কে এর ব্যাখ্যা দেবে? কারই বা জানা আছে?

কিন্তু পরিচালক হিসাবে আপনার তো জানা উচিত।

পরিচালকরা কিচ্ছু জানে না। আমার খুব বড় মাপের পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয় নি। সত্যেন বোস আর বিমল রায় ছাড়া কোনো পরিচালকই ছবি তৈরীর অ-আ-ক-খ জানে না। তাহলে আপনি কি করে আশা করবেন যে এইসব পরিচালকদের ছবিতে আমি খুব ভালো অভিনয় করব? এস. ডি. নারাং এমন পরিচালক যে ক্যামেরা কোথায় বসাতে হবে তাই জানে না। বিষন্ন চিন্তিত মুখে সিগারেট টানতে টানতে সবাইকে ‘কোয়াইট, কোয়াইট,’ বলে কয়েক পা আপন খেয়ালে পায়চারি করতে করতে নিজের মনে কি বিড়বিড় করে ক্যামেরা-ম্যানকে তার পছন্দ মতো জায়গায় ক্যামেরা বসাতে বলতো। শট নেওয়ার আগে আমাকে বলত, কিছু কর। আমি যদি বলি কিছু মানে? তখন একই কথা, আরে কর না কিছু! তখন আমার নিজের মত করে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা ছাড়া উপায় কি? এভাবে অভিনয় হয়? এভাবে কি ছবি পরিচালনা হয়? এদিকে দেখ নারাংসাবের কত ছবিই তো হিট !

সত্যিই কি কোনো ভালো পরিচালকের ডাক পাননি?

পাইনি আবার! সত্যজিৎ রায় ডেকেছিলেন ‘পরশ পাথর’ করার জন্য। ভয়ে আমি আর ওদিকে এগোই নি। এতবড় সুযোগ উনি আমায় দিয়েছিলেন কিন্তু আমি করতে পারিনি। সত্যি আমি এই বড় বড় পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভয় পাই।

কিন্তু রে তো আপনার পরিচিত।

ঠিকই বলেছেন, উনি আমার আত্মীয়। ‘পথের পাঁচালি’ তৈরীর সময় আমি তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম এবং তিনি সমস্ত টাকা সোধ দেওয়া সত্ত্বেও সুযোগ পেলেই সে কথা তুলে তাঁর সাথে মস্করাও করি।

জানেন তো কিছু লোকের ধারণা আপনি টাকার জন্য পাগল। কেউ আপনাকে ক্লাউন মনে করে। কারোর মতে আপনি অত্যন্ত ধড়িবাজ আর ধান্দাবাজও। আপনি আসলে কোনটা?

আলাদা আলাদা লোকের ক্ষেত্রে আমাকে নানা সময়ে নানা রূপে দেখতে পাবেন। আজকের এই পৃথিবীতে প্রকৃত বিবেকবান মানুষকে সবাই পাগলই বলে। আপনার কি আমাকে পাগল মনে হচ্ছে? আপনার কি মনে হয় আমি ধান্দাবাজি করি?

আমার মনে হয় আপনি টাকার ব্যাপারে একটু বেশীই ব্যস্তবাগীশ। আমি শুনেছি একবার কোনো প্রযোজক আপনার পাওনা টাকার অর্ধেকটা মেটায়নি বলে আপনি আপনার মাথা আর গোঁফের অর্ধেকটা কামিয়ে ফেলেন। আর বলেন যে বাকি টাকা মিটিয়ে দিলে আপনি আপনার ঠিকঠাক মুখ নিয়ে শুটিং-এ আসবেন ...

এই লোকগুলোকে উচিত শিক্ষা না দিলে কিছুতেই আপনার টাকা মেটাবে না। আপনি যেটা বলছেন সেটা মনে হচ্ছে ‘মিস মেরী’ ছবির ঘটনা। আসল ঘটনার ওপর লোকে রং চড়িয়ে দিয়েছে। হল কি, ছবির শুটিং করতে মাদ্রাজ গেছি কিন্তু ছবির লোকজন পাঁচদিন ধরে হোটেলে বসিয়ে রেখেছে, শুটিংয়ের ডাক আর আসে না। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছি। এমনিই একটু চুল কাটতে ইচ্ছা হল। ডানদিকের কিছুটা চুল কেটে ফেললাম। তার সাথে বাঁ দিকের চুল মেলাতে গিয়ে দেখি ভুল করে বেশি কাটা হয়ে গেছে। অগত্যা আবার ডানদিকের চুল কাটা। এই করতে গিয়ে এক সময় খেয়াল হল মাথার সব চুলই প্রায় কেটে ফেলেছি। আর তখনই শুটিংয়ের ডাক এল। আমার অবস্থা দেখে তো তাদের চোখ কপালে উঠে গেছে। ওরা ধরেই নিল আমি সত্যি পাগল হয়ে গেছি। খবর তো আর চাপা থাকে না, মাদ্রাজ থেকে বোম্বে পৌঁছে গেল। বম্বে ফেরার পর দেখলাম কেউ আর আমার কাছে আসছে না, ১০ ফুট দূর থেকেই কথা বলছে। এমন কি যারা আমাকে দেখলেই এসে জড়িয়ে ধরত, তারাও দূর থেকে হাত নাড়ছে।

আপনি কি সত্যিই টাকার ব্যাপারে কৃপণ?

আমাকে তো আমার কর মেটাতে হয়।

আমি শুনেছি ‘ইনকাম ট্যাক্স’ নিয়ে আপনাকে বেশ ঝামেলায় পরতে হয়েছে ...

কে না পরেছে বলুন তো ‘ইনকাম ট্যাক্স’-এর ঝামেলায়? আমার বকেয়া ‘ট্যাক্স’ এমন কিছু বেশি ছিল না, কিন্তু ঐ বকেয়া টাকার সুদের অঙ্কটাই বিশাল হয়ে গেছে। আমি পাকাপাকি ভাবে খাণ্ডোয়ায় গিয়ে থাকবো বলে ঠিক করে ফেলেছি। যাওয়ার আগে এখানের অনেক কিছু বিক্রি করে দেব আর এই ‘ট্যাক্স’-এর ঝামেলাও একেবারে মিটিয়ে ফেলব।

(মোটা হরফে প্রীতিশ নন্দী এবং স্বাভাবিক হরফে কিশোরকুমারের কথা)

‘নাম আমার কিশোর কুমার গাঙ্গুলি’

গায়ক হিসাবেই কিশোরকুমারের সমধিক খ্যাতি। নানা ভারতীয় ভাষায় গান গাইলেও মূলত হিন্দী ছবির গানেই তাঁর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। সারাজীবনে কতগুলি গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার সেটা অনেকেরই আগ্রহের বিষয়। মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি, গ্রামোফোন ডিস্ক, অডিও ক্যাসেট, কম্প্যাক্ট ডিস্ক এবং অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত ছবির জন্য রেকর্ড করা গানগুলিকে হিসাব করে একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে। সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার থেকেও কিছু গানের উল্লেখ পাওয়া গেছে। নতুন কোনো গানের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা যদিও কম তবু সেই সম্ভাবনা এখনও রয়েছে। সেক্ষেত্রেও তালিকার খুব সামান্যই অদল-বদল ঘটবে। গায়ক ছাড়াও কিশোরকুমার একাধারে অভিনেতা, প্রযোজক, গল্পকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, গীতিকার, সুরকার। তাঁর সেই বর্ণময় কীর্তির নানান তথ্য নিয়েই বিশেষ সংখ্যার শেষ পাতা।

ঃ চিত্র প্রযোজক কিশোরকুমার ঃ

কিশোরকুমার মোট ১৪টি ছবি প্রযোজনা করেছেন। তার মধ্যে ৬টি ছবি অসমাপ্ত। তাঁর প্রযোজনার প্রথম ছবি ‘লুকোচুরি’ ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায়। শেষ প্রযোজনা ‘দূর বাদিওঁ মেঁ কাঁহি’ ছবিটি। ছবিটি ১৯৮২ সালে মুক্তি পায়। *(কিশোরকুমার প্রযোজিত মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অসমাপ্ত ছবিগুলির বিস্তারিত তালিকা ২-এর পাতায়)*

ঃ চিত্রনট্যকার কিশোরকুমার ঃ

কিশোরকুমার চিত্র মোট ৫টি ছবির চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন। তার মধ্যে ২টি ছবি, ‘দীনু কা দীননাথ’ এবং ‘যমুনা কে তীর’, অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তাঁর চিত্রনাট্যে প্রথম ছবি ‘দূর কা রাহী’ ১৯৭১ সালে মুক্তি পায়। ‘বাড়তি কা নাম দাড়ি’ এবং ‘মমতা কি ছাঁও মেঁ’ ছবি দুটির চিত্রনাট্য তাঁর করা। প্রথমটি ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় এবং পরেরটি ১৯৮৯ সালে সেন্সর সার্টিফিকেট পেলেও মুক্তি পায় নি।

ঃ গল্পকার কিশোরকুমার ঃ

কিশোরকুমার মোট ১৫টি ছবির জন্য গল্প লিখেছেন। ‘ঝুমরু’ ছবিতে গল্পকার হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। নিজের প্রযোজিত ১৩টি হিন্দি ছবিরই গল্পকার তিনি নিজেই। এগুলির মধ্যে ৬টি ছবি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তাঁর গল্পের ভাণ্ডারের মধ্যে রয়েছে ‘দূর গগন কে ছাঁও মেঁ’, ‘দূর কা রাহী’, ‘দূর বাদিওঁ মেঁ কাঁহি’, ‘প্যার আজনবী হ্যায়’-এর মতো সংবেনশীল গল্প, তেমনিই ‘বাড়তি কা নাম দাড়ি’, ‘চলতি কা নাম জিন্দেগী’, ‘সাবাশ ড্যাডি’-এর মতো স্যাটায়ারধর্মী গল্প, বা ‘দীনু কা দীননাথ’-এর মতো ভক্তি ও আদর্শের গল্প।

ঃ চিত্র পরিচালক কিশোরকুমার ঃ

কিশোরকুমার চিত্র পরিচালক হিসাবে মোট ১২টি ছবি করেছেন। তার মধ্যে ৪টি ছবি তিনি শেষ করতে পারেননি। বাকি ৮টি ছবি মুক্তি পায়। ১৯৬৪ সালে ‘দুর গগন কি ছাঁও মেঁ’ ছবিতে তাঁর পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ। অত্যন্ত সংবেদনশীল ছবি বানিয়েছিলেন প্রথমবারের পরিচালনাতেই। তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি ‘মমতা কি ছাঁও মেঁ।’ এছাড়াও তাঁর অভিনীত অনেক ছবিতেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন যাতে ছবির দৃশ্যটিই বদলে গেছে। যেমন, পড়োশন ছবির ‘বিন্দু রে’ গানটি কিশোরকুমারের পরামর্শমত যুক্ত হয়। দৃশ্যের ‘ডায়লগ’কে তিনি গানে বদলে দেওয়ায় সেটি আরো মজাদার হয়ে উঠেছে। ‘চলতি কা নাম গাড়ি’ ছবির অনেক দৃশ্য পরিকল্পনাতেই কিশোরকুমারের ছোঁয়া রয়েছে। *(কিশোরকুমার পরিচালিত ছবির বিস্তারিত তালিকা ২-এর পাতায়)*

কিশোর পঞ্জী

প্রকৃত নাম ঃ আভাষকুমার গাঙ্গুলি
পিতা ঃ কুঞ্জলাল গাঙ্গুলি
মাতা ঃ গৌরী দেবী
ভাইবোন ঃ আশোককুমার, সতী দেবী, অনুপকুমার
স্ত্রী ঃ রুমা দেবী, মধুবালা, যোগীতা বালি, লীনা দেবী,
সন্তান ঃ অমিতকুমার, সুমিতকুমার,

১৯২৯ ঃ ৪ অগাস্ট রবিবার, তৎকালীন বেরার প্রদেশ, বর্তমান মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায় জন্ম
১৯৩৩ ঃ দিদি সতীদেবীর শশধর মুখার্জীর সাথে বিবাহ
১৯৩৪ ঃ পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু
১৯৩৬ ঃ দাদামণি অশোককুমারের নায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ
১৯৩৮ ঃ নিউ হাইস্কুলে মাধ্যমিক বিভাগে ভর্তি
১৯৪৪ ঃ ইন্দোর ক্রিশ্চিয়ান কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি
১৯৪৫ ঃ বি.এ. ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে পড়াশুনায় ছেদ
ঃ দাদামণি অশোককুমারের কাছে বম্বেতে চলে আসা
১৯৪৬ ঃ সরস্বতী দেবীর পরিচালনায় ‘কোরাস’ গাওয়া
ঃ ‘এইট ডেজ’ ছবিতে শচীন দেববর্মন ও এস. এল. পুরীর সঙ্গে প্রথম সমবেত সঙ্গীত
১৯৪৮ ঃ ‘শিকারী’ ছবিতে প্রথম চরিত্র অভিনয়
ঃ ‘সতী বিজয়’ ছবিতে প্রথম নায়ক চরিত্রে অভিনয়
ঃ ‘জিদ্দি’ ছবিতে প্রথম একক সঙ্গীত
১৯৫০ ঃ ‘মুকাদ্দার’ ছবিতে গীতা দত্তের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে ‘এক দো তিন চার’ গানটিতে প্রথম ইয়ডলিং ব্যবহার
১৯৫১ ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি রুমা ঘোষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ
১৯৫২ ঃ ৩ জুলাই প্রথম সন্তান অমিতের জন্ম
১৯৫৮ ঃ প্রথম চলচ্চিত্র প্রযোজনা ‘লুকোচুরি’
ঃ রুমা দেবীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ
১৯৬০ ঃ ১৬ অক্টোবর মধুবালার সঙ্গে বিবাহ
১৯৬১ ঃ প্রথমবার চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা ‘ঝুমরু’ ছবিতে
ঃ‘ঝুমরু’ ছবির জন্যই প্রথমবার গান লেখা
১৯৬২ ঃ পিতা কুঞ্জলাল গাঙ্গুলির মৃত্যু
১৯৬৪ ঃ প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালনা ‘দুর গগন কি ছাঁও মেঁ’
১৯৬৯ ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় স্ত্রী মধুবালার মৃত্যু
ঃ ‘আরাধনা’ ছবির গান গায়ক হিসাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়
১৯৭০ ঃ ‘আরাধনা’ ছবির ‘রূপ তেরা মস্তানা’ গানের জন্য প্রথম ‘ফিল্ম ফেয়ার’ পুরস্কার
১৯৭১ ঃ প্রথম চিত্রনাট্য রচনা ‘দুর কা রাহী’ ছবির জন্য
১৯৭৬ ঃ ৪ অগাস্ট যোগিতা বালির সঙ্গে বিবাহ
১৯৭৮ ঃ ৪ অগাস্ট যোগিতা বালির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ
১৯৮০ ঃ ১৪ মার্চ লীনা চন্দ্রভারকরকে বিবাহ
১৯৮১ ঃ দ্বিতীয় পুত্র সুমিতের জন্ম
১৯৮২ ঃ অভিনেতা হিসাবে শেষ ছবি‘দূর ওয়াদিওঁ মেঁ কাঁহি’ মুক্তি পায়
১৯৮৬ ঃ ‘সাগর’ ছবির ‘সাগর কিনারে দিল ইয়ে পুকারে’ গানের জন্য অষ্টম ও শেষ ‘ফিল্ম ফেয়ার’ পুরস্কার
১৯৮৭ ঃ ১২ অক্টোবর শেষ গান রেকর্ডিং বাপ্পী লাহিড়ির সুরে ‘ওয়াক্ত কি আওয়াজ’ ছবির জন্য
ঃ ১৩ অক্টোবর বিকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু
ঃ ১৫ অক্টোবর জন্মস্থান খাণ্ডোয়ায় শেষকৃত্য
১৯৮৯ ঃ শেষ পরিচালিত ছবি ‘মমতা কি ছাঁও মেঁ’ সেন্সর সার্টিফিকেট পায়
১৯৯৭ ঃ মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পিদের বার্ষিক ‘কিশোরকুমার অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান শুরু
২০০১ ঃ গায়ক হিসাবে শেষ ছবি ‘দো ইয়ার’ মুক্তি পায়

ঃ গায়ক কিশোরকুমার ঃ

কিশোরকুমারের আজন্ম লালিত বাসনা ছিল সায়গলের মত গায়ক হওয়ার অর্থাৎ হিন্দি ছবির ‘প্লে-ব্যাক সিঙ্গার’ হওয়ার। কোনো প্রথাগত শিক্ষা না থাকা স্বত্ত্বেও গায়ক হওয়ার এই একাগ্র ইচ্ছাই তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। খেমচাঁদ প্রকাশের তালিমে ১৯৪৮ সালে **জিদ্দি** ছবিতে গায়ক হওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু তাঁর ভেতরের গায়কটিকে বের করে আনেন শচীন দেববর্মন। তাঁর পুত্র রাহুল দেববর্মন কিশোরকুমারকে হিন্দি ছবির সমস্ত রকমের গানের জন্য অপরিহার্য করে তোলেন।

১৯৬৯ সালে আরাধনা ছবির গানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অর্থে গায়ক কিশোরের উত্তরণ ঘটল। মোট **২৬৪৮**টি গান তিনি গেয়েছেন **হিন্দি ছবি**র জন্য। এরপর সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছেন **বাংলা ছায়াছবি**র জন্য, মোট **১৫৪**টি। ভারতের অন্যান্য ভাষার ছবিগুলিতে অসমিয়ায় ১টি, ভোজপুরিতে ৪টি, গুজরাটিতে ৮টি, কান্নাড়ায় ১টি, মালয়ালমে ১টি, মারাঠিতে ৩টি, ওড়িয়ায় ৩টি এবং পাঞ্জাবি ভাষায় ১টি গান কিশোরকুমার গেয়েছেন। এছাড়াও একটি ইংরাজি ছবিতে ১টি গান গেয়েছেন। এর সাথে আধুনিক বাংলা ও হিন্দি গান আছে যথাক্রমে ৬৭টি ও ১৩টি। এই সমস্ত মিলিয়ে কিশোরকুমারের মোট গানের সংখ্যা **২৯০৫**টি।

কিশোরকুমার মোট **১৩৫ জন সুরকারের** সঙ্গে কাজ করেছেন। সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছেন **রাহুল দেববর্মনে**র সুরে। বাংলা ও হিন্দি ভাষা মিলিয়ে মোট ২২৩টি ছবিতে গান গাওয়া ছাড়াও বেশ কয়েকটি আধুনিক গানও গেয়েছেন রাহুল দেববর্মনের সুরে। মোট গানের সংখ্যা **৫৮৮**টি। রাহুল দেববর্মনের পর দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন **লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালে**র সঙ্গে ১৯২টিছবিতে মোট **৩৯৯**টি গান। তৃতীয় স্থানে **বাপি লাহিড়ি**, ১৪৭টি ছবিতে **৩১৮**টি গান। কিশোরকুমারের জীবনের শেষ গানটিও বাপি লাহিড়ির সুরে, ‘ওয়াক্ত কি আওয়াজ’ ছবির ‘গুরু গুরু, আ জাও গুরু।’ চতুর্থ স্থানে **কল্যানজী-আনন্দজী** সুরকার জুটি, তাঁদের সুরে ১৩৬টি ছবিতে মোট **২৬৯**টি গান গেয়েছেন কিশোরকুমার। পঞ্চম স্থানে **রাজেশ রোশন**, তার সুরে কিশোরকুমার ৫৮টি ছবিতে **১৫৯**টি গান গেয়েছেন।

শচীন দেববর্মন গানের সংখ্যা বিচারে ছ’নম্বর স্থানে রইলেও কিশোরকুমারকে গায়ক হিসাবে পরিচিত করে তোলার কৃতিত্বে সবার ওপরে থাকবেন। একথা স্বয়ং কিশোরকুমার নিজে স্বীকার করে গেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সাক্ষাৎকারে। শচীন কর্তা তাঁর স্নেহের কিশোরকে দিয়ে ৪৭টি ছবিতে **১২৫**টি গান গাইয়েছেন। সুরকার জুটিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ **শঙ্কর জয়কিশেন**ও কিশোরকুমারের সঙ্গে ৪৭টি ছবিতে কাজ করেছেন। এই জুটির সুরে কিশোরকুমার গেয়েছেন **১০৬**টি গান। হিন্দি ছবির কিংবদন্তী সুরকারেরা সকলেই কিশোরকুমারকে দিয়ে ছবিতে গান গাইয়েছেন। যেমন, **চিত্রগুপ্ত** ২৩টি ছবিতে **৩৮**টি গান, **মদন মোহন** ১৭টি ছবিতে **৩৮**টি গান, **সলীল চৌধুরী** ১৪টি ছবিতে **২৯**টি গান, **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়** ১৩টি ছবিতে **৩৭**টি গান, **ও. পি. নাইয়ার** ১০টি ছবিতে **৩৯**টি গান, **খৈয়াম** ১০টি ছবিতে **২৪**টি গান, **সি. রামচন্দ্র** ৯টি ছবিতে **২১**টি গান এবং **নৌশাদ ১**টি গান গাইয়েছেন।

দ্বৈতসঙ্গীত সবচেয়ে বেশী গেয়েছেন **আশা ভোসলে**র সঙ্গে **৫৯১**টি। এরপরেই আছেন **লতা মঙ্গেশকর**, তাঁর সাথে **৩১২**টি গান। **সামসাদ বেগমে**র সঙ্গে **২৪**টি এবং **গীতা দত্তে**র সঙ্গে **১৩**টি গান গেয়েছেন। **মহম্মদ রফি**র সঙ্গে **৩৬**টি এবং **মান্না দে**’র সঙ্গে **১৮**টি গান গেয়েছেন কিশোর কুমার। **মহেন্দ্র কাপুরে**র সঙ্গে **২৫**টি এবং পুত্র **অমিতকুমারে**র সঙ্গে **১৯**টি গান গেয়েছেন। **মুকেশে**র সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে আছে **২**টি গান।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148